Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 102 – 108
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্র নির্বাচিত ছোটগল্পে প্রেমের গতিপ্রকৃতি

গোলক সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া
Email ID : goloksarkar222@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Short Story, Love, Eternal, Heart, Fullness, Reality, Failed Relationship.

Abstract
Rabindranath Tagore, the first worthwhile short story writer in Bengali Literature. Every branch of literature had been an easy walk for him. Though bound by the organized and orderly environment in Jorasanko Tagore Family during childhood, he with all his soul had been intensely attracted towards the infinity. Tagore has explained nature and love through his acquired philosophical visions. Like all his other literary works, we get enlightened by the deep reality of life through his short stories. The explanation of love through his short stories is eternal. He didn't keep romance just bound by fusion. Melody of fullness has become prominent also in separation. He didn't feel the presence of both lovers to be the necessary condition for fullness of romance. Thus most of his short stories end with failed relationship. In the ongoing essay, love has been explained by four of his short stories, 'Ekratri', 'Nisheekhe', 'Durasha' and 'Postmaster'. 'Ekratri' makes reader feel the deepest truths of love. The narrator is restless when he can't get close to his childhood companion, Surabala whom the narrator once could have achieved even without any desire. At the horizons of his life, the narrator feels the absence of Surabala's love. At a time the way the author has portrayed the encounter of the narrator and Surabala at the bank of a small lake on a rainy night, is eternal. In 'Durasha' Tagore has portrayed one sided love through General Kesharlal and the daughter of the Nawab of Badrayun, Gulam Kader Khan. In the story the daughter of the Nawab was Muslim, and General Kesharlal was Brahmin. The Brahmin General could in no way accept the craving of the Muslim woman for him. But at the last moments of his life, the Brahmin general did marry and live together with a Bhutanese woman from a distinct religion. In the story 'Nisheekhe' the memories of an unfulfilled love didn't let Dakshinaranjan Babu to live with peace at any moment of his life. Dakshinaranjan Babu was unable to move out of the unconditional love of his former wife even after her death. That's why past memories floated in his mind whenever he tried to present his love towards his later wife. The last story to be discussed is 'Postmaster', where the incomplete love between the postmaster and girl kid, Ratan has been portrayed. The heartbreaking pain in the immature heart of Ratan has been portrayed through the story.

Discussion

বিশ্ববরেণ্য ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, এবং দার্শনিক। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক রূপকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ছোটগল্প রচনার যে রসদ, তা তিনি পেয়েছিলেন মূলত শিলাইদহে জমিদারির কাজ সামলানোর সময়। শিলাইদহে থাকাকালীন তিনি অনুভব করেছিলেন জীবনের ছোট ছোট, তুচ্ছ ঘটনা, ওঠা-পড়া, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা কিভাবে জীবনের গভীরতর সত্যের উপলব্ধি ঘটায়। এখানেই তার কাছে মানবীয় প্রেম উত্তীর্ণ হয়েছে জীবনের উচ্চগ্রামে, ঐশ্বরিক অনুভূতির মধ্যে। তিনি বেশিরভাগ সময়েই প্রেমের না-পাওয়ার মধ্যে দিয়ে জীবনের চিরকালের শান্তির সন্ধান করেছেন। আমরা জানি সাহিত্য সমাজের দর্পণ, কিন্তু একজন সাহিত্যিক তখনই যুগত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ হতে পারেন, যখন তার সৃষ্টির মধ্যে সমাজবাস্তবতা জীবনের চরম সত্যের মধ্যদিয়ে, নান্দনিক অনুভূতির দ্বারা ঘনীভূত হয়ে পাঠকের সম্মুখে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়। আসলে পরিচিত জগতের মধ্যদিয়ে বিচরণ করতে করতে, একজন কালজয়ী স্রষ্টা সচেতন মুহূর্তে অপরিচিত জগতের সুর শুনিয়ে যান। এখানেই একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটে। আলোচ্য গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে আমরা সেই শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান পাই।

উপনিষদের জ্ঞানে পুষ্ট ছিল তার মনোজগত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ শিল্প-সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষ্য করা যায় না। শিল্প-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে তিনি প্রেম, প্রকৃতি এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর অর্জিত দার্শনিক দৃষ্টিতে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রেমের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা সাধারণ দৃষ্টির অতীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে প্রেমের পরিণতি শুধুমাত্র মিলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি— বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়েও প্রেমের পরিণতি লক্ষ্য করা যায় তাঁর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে। সাধারণ দৃষ্টিতে বিচ্ছেদের মাধ্যমে একটি প্রেম কিভাবে পরিণতি লাভ করে তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ তিনি দিয়েছেন তার 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে অমিত ও লাবণ্যের বিচ্ছেদের মধ্যদিয়ে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সাহিত্যে কিছু নতুনত্ব আসে। আর সেই নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায় 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে, অমিত ও লাবণ্যের অসমাপ্ত ভালোবাসার গল্পের মধ্যদিয়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পড়েছে এই উপন্যাসে। তাই এই উপন্যাসে আধুনিক অভিজাত সমাজের সম্পর্কের মেলবন্ধন এসেছে, তার সঙ্গে এসেছে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ও বিরহের প্রসঙ্গ। বলা যায় শেষ জীবনে এসে ঔপন্যাসিক দুজন মানবিক প্রেমের কাহিনি লিখলেন এবং তা কোন সোজাসাপটা প্রেম নয়, তা হল চতুর্ভূজাকৃতির প্রেম। এই প্রেমের গল্পকে রবি ঠাকুর বিচ্ছেদের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন রসগ্রাহী পাঠকের মনের মনিকোঠায়। বলা যায় প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, তারই প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। তিনি কখনোই বিবাহের মধ্যে প্রেমের সমাপ্তি ঘোষণা করেননি। প্রেমে আবেগ রয়েছে কিন্তু সেই আবেগ শরীরের মিলনে নয়, আত্মার বন্ধনে রয়েছে। শারীরিক মিলন তো শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি মাত্র, আসল অনুভূতি তো মনের বন্ধনে। আসলে তিনি প্রেমকে সবসময় মানবীয় দৃষ্টিতেই ব্যাখ্যা করেছেন এমনটা নয়, অনেক সময় এই প্রেমের ব্যাখ্যা তার কলমে দিব্যদৃষ্টির মধ্যদিয়েও বাহিত হয়েছ। আর এখানেই তার প্রেমের ব্যাখ্যা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। প্রেমানুভূতির জন্য তিনি অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তির শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজনবোধ করেনি বরং বলা যায় ব্যক্তির শারীরিক উপস্থিতিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি প্রেমের অন্তরায় বলেও মনে করতেন। কল্পিত নারী বা পুরুষের প্রেম কল্পনার জগত থেকে যখন বাস্তবের জগতে চলে আসে তখন তা সংসারের ত্রিসীমানার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে আর সেই স্বর্গীয় প্রেমের অনুভূতি থাকেনা। তবে সবক্ষেত্রেই যে তিনি স্বর্গীয়প্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এমনটাও নয়। মানসিক চাহিদার পাশাপাশি শারীরিক কামনা-বাসনাকেও প্রেমের পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। সে কারণেই হয়তো 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। সেখানে কাদম্বরীর নারীসত্তা তথা নারীর শারীরিক চাহিদাকে অস্বীকার করা হয়েছে, সেটাকেই তিনি কাব্যের ক্ষেত্রে উপেক্ষিতা মনে করেছেন। 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আমরা নায়ক-নায়িকার মানসিক চাহিদার পাশাপাশি শারীরিক চাহিদারও আবেদন লক্ষ্য করি। আসলে বাস্তব জগতে মানুষের মোহ, মায়া, কামনা, বাসনার বাস্তবতাকে

কখনো অস্বীকার করা যায় না। আর বাস্তবতা হল সাহিত্যের একটি প্রধান উপকরণ, যা সাহিত্যকে জীবন্ত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রেমের এই বিচিত্র ভাবনার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত রবীন্দ্রনাথের চারটি ছোট গল্পের আলোকে প্রেমের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই গল্পগুলি হল— 'একরাত্রি', 'নিশীথে', 'দুরাশা' ও 'পোস্টমাস্টার'।

আলোচনার প্রথমেই যে গল্পটি বেছে নেওয়া হয়েছে তা হল 'একরাত্রি' গল্প। 'সাধনা' ও 'ভারতী' পর্বে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'একরাত্রি'। এই পর্বের ছোটগল্পগুলিতে প্রেমের গভীরতর সত্য প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রেমের ব্যাখ্যা একে-অপরের থেকে স্বতন্ত্র। কোথাও রয়েছে প্রেমের মৌনতা, কোথাও রয়েছে ব্যর্থ প্রেমের গল্প, আবার কোথাও রয়েছে প্রেমের বিশ্বাস ভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ প্রেমের বৈচিত্র্যময়তা এই পর্বের গল্পগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তথাকথিত প্রেমের সরল গতি এখানে দেখা যায় না। 'একরাত্রি' গল্পটিতে সাধারণ প্রেম অসাধারণত্ব লাভ করেছে। গল্প কাহিনির অন্তরাত্মার মধ্যে রয়েছে প্রেমের অনুশোচনার মধ্যদিয়ে প্রাপ্তির পূর্ণতা। মোহভঙ্গের যে তীব্র জ্বালা, বেদনা গল্পটির মধ্যে তা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রেমের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত না হলেও বিরহের মধ্যদিয়ে প্রেমের চিরন্তন ও শাশ্বত রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

'একরাত্রি' গল্পে আমরা দেখতে পাই গল্পকথক এবং সুরবালার অসমাপ্ত প্রেমের কাহিনি। গল্পে গল্পকথক এবং সুন্দরী সুরবালা একসঙ্গে বড় হয়েছে, বর-বউ খেলেছে এবং সুরবালা গল্পকথকের ফাইফরমাশ খেটেছে। আশেপাশের মানুষের কাছে সুরবালার রূপের যথেষ্ট সুনাম থাকলেও গল্পকথকের কাছে বিষয়টি নিতান্তই নগণ্য ছিল। একসময় গল্পকথক ও সুরবালার বাড়ি থেকে সুরবালার সঙ্গে গল্পকথকের বিবাহের প্রস্তাব উঠলে গল্পকথক পাড়িদেন সুদূর কলকাতায়, জজকোর্টের হেডক্লার্ক হওয়ার লক্ষ্যে। ইতিমধ্যেই সুরবালার বিবাহ হয় উকিল রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এদিকে কথক ছাত্ররাজনীতিতে ঢুকে জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। কিছুদিন পর তার পিতা মারা যান। শেষমেষ একটি আধাশহরের প্রাইমারি স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারি পদে চাকরি পান কথক। কাকতালীয় ভাবে রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছেই একটি প্রাইমারি স্কুলে কথকের পোস্টিং হয়। কর্মসূত্রে রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের সাথেও পরিচয় হয়। একদিন কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য বা শুধু আলাপচারিতার জন্য কথক রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি যান। সেখানে সুরবালাকে বিবাহিত নারী হিসেবে দেখে সেই অধরা প্রেমানুভূতি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে তার মনের মনিকোঠায়। এক সময় যাকে না চাইতেই পাওয়া যেত আজ তাঁকে পাওয়া তো দূরের কথা একটু দেখার অধিকারটুকুও নেই। রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বার্তালাপ করার সময় গল্পকথক অনুভব করেন—

> "এমন সময় পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুরির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোন কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল— বিশ্বাস সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড় বড় চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃদপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল। ... মনের ভিতরে কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবেনা।"[১]

এরপর রামলোচন কিছুদিনের জন্য বাইরে যান। এই সময় একদিকে যেমন স্কুলঘরে কথক একা বাস করছে, অন্যদিকে সুরবালাও তার বাড়িতে একা। এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টার প্রচন্ড বৃষ্টিতে ভেসে যায় সমগ্র গ্রাম। মনে হয় সমগ্র বিশ্বসংসার ধ্বংসের মুখোমুখি। তখন সুরবালা যেমন কথকের নিকট ছুটে আসে তেমনি কথকও সেই সুরবালার দিকে ছুটে চলে এবং তারা মিলিত হয় নিকটবর্তী একটি উচু পুকুরের পাড়ে। চারিদিকে জল থৈ থৈ, মাঝখানে পুকুরের পাড়টি এখনো ডোবেনি। গল্পকথক এবং সুরবালা একে-অপরের মুখোমুখি। সমগ্র বিশ্বসংসার যেখানে ধ্বংসের মুখোমুখি সেখানে দু-জন বেচে রয়েছে একে-অপরের জন্য— এমনটাই মনে হচ্ছিল তাদের দু-জনের। এই খানে প্রেমানুভূতির

অন্তর্নিহিত প্রকাশ ঘটেছে গল্পকার রবি ঠাকুরের কলমের তীক্ষ্ণ ডগাই। গল্পকথকের হৃদয়বিদারক, মর্মভেদী প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এখানে চূড়ান্ত ভাবে–

> "আজ সমস্ত বিশ্ব সংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা, কোন-এক জন্মান্তর, কোন-এক পুরাতন রহস্যাঅন্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর, আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ঙ্কর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।"[২]

এই ছোট্ট একটি মুহূর্তের ঘটনার মধ্যদিয়ে গল্পে প্রেম পরিণতি লাভ করেছে। গল্পের সমাপ্তিতে কথকের অন্তরাত্মা বলে উঠেছে–

> "আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল– আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।"[৩]

কথায় আছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ এগুলি প্রেমের কাছে নগণ্য। 'দুরাশা' গল্পে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুটা এই কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ সেনাপতি কেশরলালের প্রতি বদ্রায়ুনের নবাব গোলামকাদের খানের কন্যার প্রেমানুভূতির তীব্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে আলোচ্য গল্পে প্রেমের সুযোগ্য পরিণতি লক্ষ্য করা যায় না। নবাবকন্যা কেশরলালের প্রেম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়িয়েছেন ঠিকই কিন্তু শেষমেশ তার প্রেম পরিণতি লাভ করতে পারেনি। কারণ নবাব কন্যার প্রেম ছিল একতরফা। নবাব কন্যার প্রতি কেশরলালের কোন প্রেমানুভূতি ছিলনা। বরং মুসলিম কন্যা হওয়ার জন্য তার কাছে ঘৃণার পাত্রী ছিল। যদিও গল্পের অন্তিমলগ্নে আমরা দেখতে পাই কেশরলালের বিবাহ হয়েছে ভিন্ন ধর্মের একটি মেয়ের সঙ্গে এবং সেই বিবাহের মধ্য দিয়ে তিনি সুখে-শান্তিতে সংসারও করেছেন। আসলে জীবনের দাবীর কাছে জাতি, ধর্ম এগুলি যে নিতান্তই নগণ্য বিষয়, গল্পের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে হয়তো গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে ধরতে চেয়েছেন। আলোচ্য গল্পে বদ্রায়ুনের নবাব গোলামকাদের খানের সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ যুবক কেশরলাল। নবাবকন্যা এই রূপবান, সুপুরুষ কেশরলালের প্রেমে এতটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, মুসলিম হয়েও হিন্দুধর্মের দেবদেবীর প্রতি কৌতুলপরায়াণবসত হিন্দুদাসীর কাছে হিন্দুধর্মের পাঠ নিতে থাকেন — শুধুমাত্র কেশরলাল হিন্দু বলে। গোপনে কেশরলালকে সাহায্য করতে থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে জল দিয়ে কেশরলালের প্রাণরক্ষা করেন। পরক্ষনেই কেশরলাল তার প্রাণ রক্ষাকর্তা হিসেবে নবাব কন্যাকে দেখে ক্রোধান্বিত হন– কারণ তার প্রাণদাতা মুসলিম। কেশরলাল একসময় স্বদেশী আন্দোলনের জন্য ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে নবাবকন্যা কেশরলালের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন। নিজেকে হিন্দুরমনী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ভাবে ৩৮ বছর ধরে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় নেপালের এক ভুটিয়া পল্লীতে ভুটানী মেয়ের সাথে সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার করতে দেখেন কেশরলালকে। এখানেই গল্পের সমাপ্তি। গল্পের পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে প্রেম পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি বরং নবাবকণ্যার একতরফা প্রেমের ব্যর্থতার কাহিনিই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রেমানুভূতি মানুষকে কতটা শারীরিক এবং মানসিকভাবে বেগবান করে তোলে তা নবাবকণ্যার ছুটে চলার মধ্যে দিয়েও প্রমাণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা যে প্রেমের অন্তরায় হতে পারেনা বা এটা প্রেমের পক্ষে একটা অজুহাত মাত্র, গল্পের শেষে কেশরলালের ভুটানী মেয়েকে বিবাহ করার মধ্যদিয়ে তা ইঙ্গিত করেছেন গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যে ব্যক্তি, ভিন্নধর্মী হওয়ার কারণে একজন নারীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছে, পরবর্তীকালে সেই আবার ভিন্নধর্মী মেয়েকে বিবাহ করে সংসার করছে।

সত্যিকারের প্রেম যে কতটা মর্মভেদী হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিশীথে' গল্পে দক্ষিণাচরণবাবু ও তার স্ত্রীর অপরিতৃপ্ত প্রেমের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অতৃপ্ত প্রেমের হৃদয়বিদারক যন্ত্রনা কতটা ভয়ঙ্কর

হতে পারে তা এই গল্পে লক্ষ্য করা যায়। সেইসঙ্গে এই গল্পে দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথম স্ত্রীর নারীসত্তার দৃঢ় ও বলিষ্ঠরূপ প্রখরভাবে বিকশিত হয়েছে। দক্ষিণাচরণ বাবুর প্রথম স্ত্রীর চরিত্রের উজ্জ্বলতার কাছে দ্বিতীয় স্ত্রী মনোরমা অনেকটাই ক্ষিণপ্রভ প্রতিপন্ন হয়। প্রথম স্ত্রীর প্রেমের বন্ধন এতটাই প্রখর ছিল যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও দক্ষিণাচরণবাবু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মুক্তি পাননি বা প্রথম প্রেমের বন্ধনের রজ্জু কেটে বেরিয়ে এসে মনোরমার প্রতি অবাধ প্রেমনিবেদন করতে পারেনি। তার দ্বিতীয় প্রেমের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রথম স্ত্রীর বিভীষিকাময় ভালোবাসার স্মৃতি। আসলে দক্ষিণাচরণবাবু তার প্রথম স্ত্রীকে এতটাই ভালবেসেছিলেন যে, তার পক্ষে কোনভাবেই দ্বিতীয়বার কাউকে ভালোবাসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে অনেক সময় কঠিন বাস্তবতাকেও মেনে নিতে হয়। তাই প্রথম স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় যখন কতরাচ্ছে তখন দক্ষিণাচরণবাবু হারান ডাক্তারের কন্যা মনোরমাকে মরুভূমির মরীচিকার মত দেখেছেন। একদিকে স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শায়িত অন্যদিকে হারান ডাক্তারের কন্যা মনোরমাকে দেখে দক্ষিণাচরণবাবুর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন গল্পকার—

> "মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না। ...রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।"[৪]

তাই যখন প্রথম স্ত্রীর প্রেমের বন্ধনকে ভুলে গিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী মনোরমার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে গিয়েছেন দক্ষিণাচরণবাবু তখনি তার কানে বেজে উঠেছে প্রথম স্ত্রীর কণ্ঠস্বর — 'ও কে। ও কে গো।'। বাস্তব জগতের কামনা-বাসনা, চাহিদা সবকিছুই মোহ-মায়ার দ্বারা আবদ্ধ এবং আমরা প্রত্যেকেই সেই মোহজালে জড়িত রয়েছি, সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। বাস্তবকে অস্বীকার করে কখনও জীবন পূর্ণতা লাভ করে না। দক্ষিণাচরণবাবু প্রেমের সেই মায়াজালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন সেখান থেকে তার মুক্তির কোন মার্গ জানা ছিল না। কিন্তু তাকে জীবনের প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়তে হয়েছে বা বিবাহ করতে হয়েছে। দক্ষিণাচরণবাবু যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তখন তার স্ত্রীর অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা আরোগ্য প্রাপ্তি লাভ করেন। তাই সদাহাস্যময়ী, পতিব্রতা প্রথম স্ত্রীর প্রেম এতটাই তীব্র ছিল যে, মৃত্যুর পরেও দক্ষিণাচরণবাবুর স্মৃতিপটে থেকে গেছে তার অম্লান ছাপ। তাই দ্বিতীয় স্ত্রী মনোরমাকে নিয়ে কোন এক নির্জন স্থানে রাত্রিযাপনের সময় এক নিভৃতচারী পাখির ডাক শুনে চমকে উঠেছে দক্ষিণাচরণবাবু। সেই পাখির ডাক তার প্রথম স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়েছে। এই গল্পে দক্ষিণাচরণবাবুর যে জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে তার মধ্য দিয়েই তার প্রথম স্ত্রীর প্রেমের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এই ভাবে আলোচ্য গল্পে প্রেম, বাস্তবতাকে অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়েছে স্বর্গীয়লোকে।

'পোস্টমাস্টার' রবীন্দ্রনাথের একটি ভিন্ন স্বাদের ছোটগল্প। আগের গল্পগুলিতে প্রেমের যে অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'পোস্টমাস্টার' গল্পটিতে প্রেমের ব্যাখ্যা একটু অন্যতর; বা বলা যায় এটি আসলে কোন প্রেমের গল্পই নয়। শূন্যতাবোধ থেকে স্নেহপ্রবণ মানবহৃদয়ের যে অন্তরের সহানুভূতি, ভালোবাসা, একসময় মোহ ও মায়ার বন্ধনে মানুষকে আবদ্ধ করতে পারে তার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আলোচ্য গল্পে। একদিকে কলকাতার যুবক পোস্টমাস্টার অন্যদিকে গ্রামের পিতৃমাতৃহারা নাবালিকা রতনের একটি নিবিড় সম্পর্ক ফুটে উঠেছে এই গল্পে। সেই সম্পর্কের মধ্যদিয়ে নাবালিকা থেকে রতনের উত্তরণ ঘটেছে চিরপরিচিত নারীসত্তায়। সেই নারী কখনো প্রণয়িনী, কখনো জননী। একদিকে গ্রামের পিতামাতাহারা দরিদ্র রতনের অসহায়তা এবং জীবনের শূন্যতাবোধ, অন্যদিকে কলকাতার যুবক পোস্টমাস্টারের অপরিচিত ও অনভ্যস্ত প্রত্যন্ত গ্রামে আগমনের ফলে একাকীত্ব, ও নিত্যসঙ্গতা। রতনের মতো একজন নাবালিকাকে কাছে পেয়ে কাছের মানুষ বলে মনে হয়েছে পোস্টমাস্টারের। আসলে কলকাতার যুবক পোস্টমাস্টারের এমন একটি প্রত্যন্ত গ্রাম্যপরিবেশে জীবনযাপন একেবারেই অপরিচিত ছিল।

অনেক সমালোচকের মতে 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি 'হিতবাদী' পর্বের শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে পরিগণিত। গল্পটি একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। কেউ কেউ আবার গল্পটিকে প্রেমের গল্পের বিভাগে রাখতে নারাজ। তবে যে প্রেমের ব্যাখ্যা এখানে রয়েছে, তা মূলত অপূর্ণ প্রেমের গল্প। রতনের বয়সন্ধিকালের আলো-আঁধারীর হৃদয় অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য গল্প। সমগ্র গল্পের মধ্যে রতনের যে প্রেমানুভূতি, তা অবাস্তবতার ওপর ভর করে দাঁড়িয়েছিল। তেলশূন্য প্রদীপের ক্ষীণপ্রভ শিখামাত্র ছিল রতনের প্রেম। এক সময় সেই প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তিটি যথার্থ—

> "পোস্টমাস্টারের জীবনে রতনের প্রেম এসেছিল প্রেমের মতোই, বসন্তের ফুলকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা যেমন বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে হারিয়ে যায়— এই গল্পের পরিণামও তাই। প্রকৃতির উদ্দাম বিষন্নতার মধ্যেই ছোট জীবনটুকুর সমাপ্তি ঘটেছে।"[৫]

গল্পের শুরুতেই গল্পকারের কথাতে ফুটে উঠেছে—

> "জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গন্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাশে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যেসকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের শহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।"[৬]

কিন্তু কোনোভাবেই পোস্টমাস্টারের রতনের প্রতি প্রেমের অনুভূতি প্রকাশিত হয়নি। গল্পে যেটুকু দেখানো হয়েছে তা নিতান্তই এক সহায়-সম্বলহীন, দরিদ্র গ্রাম্যবালিকার প্রতি স্নেহ, করুণা ও সহানুভূতি। বা বলা যায় রতনের প্রতি পোস্টমাস্টারের প্রেমের অনুভূতি থাকলেও গল্পের মধ্যে তা গোপন থেকেছে। আসলে কলকাতার যুবকের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না এরকম একজন গ্রাম্যবালিকার প্রেম গ্রহণ করা। তাই পোস্টমাস্টার একাকীত্ব জীবনে রতনকে কাছে পেয়ে তার মনের কথা সব খুলে বলেছে ঠিকই কিন্তু যখনই রতন তার বাড়ি যাওয়ার জন্য আবেদন করেছে তখন পোস্টমাস্টার বলেছে — 'সে কী করে হবে'। আসলে এর মধ্য দিয়ে হয়তো গল্পকার ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, এই গ্রাম্যপরিবেশে তার একাকীত্ব ঘোচানোর জন্য রতনের যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকুই রতনের ভূমিকা। কলকাতার যুবকের বৃহত্তর, প্রগতিশীল, আধুনিক জীবনের সঙ্গে কখনোই রতনের সংযোগ ঘটানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে রতনের নাবালিকা মনে স্নেহপ্রবণ পোস্টমাস্টারের সহানুভূতি ধীরে ধীরে প্রনয়ের বসন্তের বাতাস বইয়ে দিয়েছে। এখান থেকেই নাবালিকা রতন সাবালিকা হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে জেগে উঠেছে চিরন্তন নারীসত্তার প্রকাশ। তাই যখন ঘনবর্ষা রাতে পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে তখন একজন দায়িত্বময়ী সাবালিকা নারীর মতোই সারারাত ধরে তাকে সেবা - শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলেছে। গল্পকারের বর্ণনা—

> "বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তে সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি'।"[৭]

এখানেই আলোচ্য গল্পে রতন চরিত্রের সার্থকতা। চিরন্তন নারীসত্তার যে দুটি রূপ—জননী ও প্রণয়িনী তা, রতন চরিত্রের পরিণতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রতন চরিত্রে এই পরিণতির মধ্য দিয়ে পোস্টমাস্টারের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি হয়েছে। তাই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় বারবার তার মনে হচ্ছিল— 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।' কিন্তু পরক্ষণেই যখন নৌকার পালে বাতাস লেগেছে তখনই রতনের শূন্যতাবোধ তার মন থেকে মুছে গেছে। আসলে পোস্টমাস্টারের স্বাভাবিক হৃদয় রতনকে অস্বীকার করলেও তার অন্তরাত্মা রতনকে অস্বীকার করতে পারিনি, তার বিবেক, মনুষ্যত্ব বারবার রতনের ভালোবাসার অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু সেটাও ক্ষনিকের

মায়া মাত্র। আর এখানেই রতন উপেক্ষিতা হয়েও হয়ে উঠেছে প্রণয়িনী নারীসত্তার প্রতীক। এ প্রসঙ্গে রতনের পোস্টমাস্টারের প্রতি শেষ সংলাপগুলি অনুধাবনযোগ্য—

> "দাদাবাবু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি; আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।"[৮]

আর এভাবেই পোস্টমাস্টার গল্পটি রবি ঠাকুরের কলমে অন্যমাত্রা লাভ করেছে।

আলোচনার উপসংহারে এসে বলতে হয় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে প্রেম একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। প্রেম সেখানে শুধুমাত্র নায়ক-নায়িকার রোমান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার প্রেমের পরিণতি ব্যক্তিকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে নৈব্যক্তিক। 'একরাত্রি' গল্পে যেমন সুরবালার সঙ্গে কথকের মাহেন্দ্রক্ষণের মুহূর্তকে তার 'তুচ্ছ জীবনের চরম সার্থকতা' বলে উল্লেখ করেছেন অন্যদিকে 'দুরাশা' গল্পে নবাবকন্যার প্রেমের সেই অতৃপ্ত বাসনার মধ্য দিয়েই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'নিশীথে' গল্পে দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথম স্ত্রীর প্রণয় এক মুহূর্তের জন্যও তার পিছু ছাড়েনি, মৃত্যুর পরেও সেই প্রণয় অম্লান ছাপ রেখে গেছে দক্ষিণাচরণ বাবুর মানসপটে। অন্যদিকে 'পোস্টমাস্টার' গল্পে সেই মহৎপ্রেমের মধ্য দিয়েই নাবালিকা রতনের মধ্যে চিরন্তন নারীসত্তার মহত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রেম ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে।

Reference :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভা, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১০, পৃ. ৭৩
২. তদেব, পৃ. ৭৫
৩. তদেব, পৃ. ৭৬
৪. তদেব, পৃ. ২২৬
৫. সিংহ, মীনাক্ষী, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল (সম্পাদনা), সাহিত্য প্রবন্ধ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯, পৃ. ৭৫৯
৬. তদেব, পৃ. ১৬
৭. তদেব, পৃ. ১৭
৮. তদেব, পৃ. ১৯